বেদ-বেদান্ত প্রবেশিকা

শ্রী অমিয় মুখার্জী

ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও
সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

CamScanner

বেদ-বেদান্ত প্রবেশিকা

সম্পাদনায় ঃ
শ্রী অমিয় মুখার্জী

ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও
সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

CamScanner

মুখবন্ধ

জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশের ফলে বিশ্বজগত মানব জাতির হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা। দেশ প্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ একটি পেশাজীবী শ্রেণী সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। এই মহতী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পটি তার দায়িত্ব পালন করে চলেছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরোহিত ও সেবাইতগণকে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে এবং ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমাজের নেতৃত্ব দানের সক্ষমতা অর্জন করতে বিভিন্ন মন্দিরের পুরোহিত ও সেবাইতদের ১) হিন্দু আইন ও পূজা পদ্ধতি ২) ভূমি আইন, আইসিটি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ ৩) সামাজিক মূল্যবোধ ৪) কৃষি ও বনায়ন ৫) গৃহপালিত পশুপালন ও মৎস চাষ এবং ৬) খাদ্যপুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা এই ৬টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

উল্লেখিত ৬টি বিষয়ের মধ্যে হিন্দু আইন ও পূজা পদ্ধতি বিষয়টি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি, ধর্মচর্চার প্রচার ও প্রসার ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুরোহিত ও সেবাইতগণের মধ্যে জানার আগ্রহ বেড়েছে এবং তাঁরা হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ সম্পর্কে জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। তাঁদের চাহিদা এবং জানার প্রবল ইচ্ছা শক্তি দেখেই 'বেদ-বেদান্ত প্রবেশিকা' গ্রন্থনাটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশের উদ্যোগ প্রকল্প কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে।

বেদ হিন্দুদের আদি ও মূল ধর্মগ্রন্থ। বেদ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির মূল উৎস। বেদকে শ্রুতি সাহিত্যও বলা হয়। কারণ বেদের লিখিত কোন বই পুস্তক আকারে ছিলনা। একজন সূত্রধর যেমন নিপুণভাবে রথ নির্মাণ করেন ঠিক তেমনই ঋষিগণ দক্ষতার সাথে বেদ গ্রন্থনা করেছেন। বেদের সংখ্যা ৪ (চার) যথা: ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। প্রত্যেকটি বেদ আবার চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: সংহিতা (মন্ত্র ও আশীর্বচন), ব্রাহ্মণ (ধর্মীয় আচার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদির উপর টীকা), আরণ্যক (ধর্মীয় আচার, ক্রিয়া কর্ম, যজ্ঞ ও প্রতীকী যজ্ঞ) ও উপনিষদ।

উপনিষদে হিন্দুধর্মের অধ্যাত্মজ্ঞান ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত আছে। উপনিষদে যে তত্ত্বজ্ঞান বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে তাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ অংশ বলে বিবেচিত। জীবনের প্রকৃত গূঢ় অর্থ নির্ধারণে একশ্রেণীর উৎসুক মানুষ সংসার ত্যাগ করে অরণ্যে বসে গভীর ধ্যান-ধারণা করতেন, তাঁদের চিন্তা প্রসূত উক্তিগুলিই উপনিষদে স্থান পেয়েছে। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নই বেদের তত্ত্ব বোধগম্য করার জন্য বেদের ভাষ্যস্বরূপ উপনিষদ লেখেন।

উপনিষদকে বলা হয় বেদান্ত। 'বেদ' মানে জ্ঞান আর 'অন্ত' মানে শেষ। অর্থাৎ জ্ঞানের শেষ। এই কঠিন দুর্বোধ্য বিষয়টিকে সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করার জন্য পুরোহিত এবং সেবাইতদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন, হিন্দু শাস্ত্রীয় গবেষক ও প্রশিক্ষক শ্রী অমিয় মুখার্জী 'বেদ-বেদান্ত প্রবেশিকা' পুস্তিকাটি রূপ দান করে যে গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন তার জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রফেসর শিখা চক্রবর্তী
প্রকল্প পরিচালক
ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোতি ও
সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

CS CamScanner

ওঁ

বেদ-বেদান্ত প্রবেশিকা

শ্রী অমিয় মুখার্জী

প্রারম্ভ: মন্ত্রীর প্রবেশ মন্ত্রণালয়ে, শিক্ষকের প্রবেশ বিদ্যাপীঠে, ব্রাহ্মণের প্রবেশ যাগযজ্ঞে আর বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। প্রত্যেকেই স্বাধিকার নিয়ে আপন আপন স্থানে প্রবেশ করে। এই অধিকার বা যোগ্যতা অর্জন করতে স্ব স্ব সংস্কৃতির বিষয়ভিত্তিক নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হয়। সকল মানুষের সব বিষয়ে প্রবেশাধিকার রয়েছে বটে কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান ও যোগ্যতা না থাকলে মূলসত্য উদ্ঘাটনে সফলতা আসে না। আদিকাল থেকে অমৃত পিপাসার সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে মানবহৃদয় সদা ব্যাকুল। এই অমৃত পিপাসার কাছে জাগতিক ধন-সম্পদ ভূলুণ্ঠিত। হত দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্বপ্নে আদেশ পেলেন, বৃন্দাবনে যমুনাতীরে সনাতন গোস্বামীর শরণাপন্ন হলে তিনি তাঁর দারিদ্রতা ঘুচিয়ে দিবেন। ব্রাহ্মণ যথা আজ্ঞায় সাধক সনাতনের পায়ে পড়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন; দারিদ্রতা মোচনের জন্য একজন সন্নাসী কী দিবেন এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে, এমন অনেক ভেবে সাধু সনাতনের মনে পড়ল বহুদিন পূর্বে একটা পরশমানিক পেয়ে তিনি বালুমধ্যে পুঁতে রেখেছিলেন এই ভেবে, যদি কখনও কারও কাজে লাগে। ব্রাহ্মণের অনুরোধে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সেই পরশমানিকটি তিনি নিতে বললেন। ব্রাহ্মণ অদূরে দ্রুত এসে বালু খুঁড়ে পরশমানিকটি হাতে নিতেই তার মাদুলি দুটি সোনা হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন; অতঃপর বালুর উপর বসে নীরব শান্ত হয়ে যমুনার সমাহিত তরঙ্গরাশি আর অস্তগামী সূর্যের পানে অপলক নেত্রে চেয়ে থেকে কী যেন ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ উঠে এসে পরশমানিকটি নদীজলে ছুঁড়ে ফেলে সাধুর চরণে লুটিয়ে পড়ে তিনি বললেন—

'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নত শিরে'। এই বলি নদী নীরে
ফেলিল মানিক।

এ তো গেল রবীন্দ্রনাথের স্পর্শমণির কাব্যিক রূপক। কিন্তু এর থেকেও জীবন্ত বৈদিক দৃষ্টান্ত প্রণিধানযোগ্য। এবার হতদরিদ্র ব্রাহ্মণ নয়, সম্ভ্রান্ত ধনবান ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর সকল ধনসম্পদ দুই স্ত্রী—মৈত্রী ও কাত্যায়নীকে সমবন্টন করে সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। মৈত্রী দুঃখ পেয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন, 'যন্নু মে ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি' (বৃহঃ২/৪/২)। অর্থ: 'ভগবন্! আমার সমগ্র পৃথিবী যদি ধনসম্পদ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, বলুন তাতে কি আমি অমরত্ব লাভ করব'? যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্ট বললেন তা সম্ভব নয়। তখন মৈত্রী আবার বললেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাৎ? (ঐ২/৪/৩)। অর্থ: 'যা দ্বারা আমি অমৃত লাভ করতে পারব না, তা দিয়ে আমি কী করব'? যিনি জ্যোতির্ময় অমৃতত্বের অভিলাষী তার কাছে পার্থিব সম্পদ মূল্যহীন জড়পদার্থ সম। যার ভিতর আত্মজ্ঞান লাভের ঢেউ উঠেছে, তাকে পার্থিব সম্পদের মোহে বদ্ধ করা যায় না; তা সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র বা স্ত্রীজাতি যাই হোক না কেনো, তখন সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হয়ে যায়। যে তাঁকে স্মরণ করে তিনি তাকে বরণ করে নেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুংস্বাম ॥মুণ্ডকঃ৩/২/৩॥

অর্থ: 'শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, শ্রবণে বা মেধাশক্তি দ্বারাও ইনি লভ্য নন। তিনি যাকে বরণ করে নেন, সে-ই তাঁকে লাভ করে; তার কাছেই তিনি আপন তনু উজাড় করে খুলে ধরেন'।

CS CamScanner

তাহলে বুঝতে হবে এই হলো ব্রহ্মজ্ঞানে প্রকৃত অধিকারী হওয়ার ভগবৎ নির্দেশিত উপায়। সুতরাং সত্য ও সুন্দরকে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে কোনো লাভ নেই। তর্কযুক্তির মৃত্যু না ঘটলে জ্ঞান-প্রজ্ঞার জন্ম হয় না। যারা জানতে পারে একমাত্র পরমসৎকে, যিনি কার্য-কাল ও কারণের অতীত, বিশ্বাতীত হয়েও যিনি মর্ত্যের সকল জীবভূত আত্মা, তারা এই অমৃত সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। 'সে যে মণিকাঞ্চন ঠেলে পায়, রাজমুকুট চরণে দলে যায়, কি বস্তু হিয়া মাঝে পায়, আমাদের সনে কথা কহে না কহে না; সখা তোমারে পাইলে আর' (রজনীকান্ত)। মন, প্রাণ ও দেহচেতনার পরিশুদ্ধি দ্বারা আত্মপ্রস্তুতি থাকলে ওপার থেকে ভববন্ধন মুক্তির ডাক আসে। একবার এই ডাক এলে আর ফিরে যাবার নয়। যেমন এসেছিল বালক নচিকেতার, কঠোপনিষদে যার বর্ণনা রয়েছে।

মৃত্যুদেব যমের কাছে নচিকেতা মানব আত্মার অবস্থান তথা মরণোত্তর অমৃতপ্রদায়ী পরাজ্ঞান জানতে চেয়েছিল। নচিকেতা এই জ্ঞানের আধিকারিক কি না তা যাচাই করতে বিনিময়ে মৃত্যদেব তাকে জাগতিক ঐশ্বর্য্যে ভরে দিতে চেয়েছিলেন। যেমন—

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥কঠঃ ১/১/২৩॥
এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাং চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥কঠঃ ১/১/২৪॥
যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যা ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মাহনুপ্রাক্ষীঃ ॥কঠঃ ১/১/২৫॥

যমঃ 'নচিকেতা! তুমি শতায়ু জীবন, পুত্র-পৌত্রাদি, বহুসংখ্যক গাভি, হস্তি, অশ্ব ও মূল্যবান স্বর্ণালংকারাদি, বৃহৎ আয়তনের ভূমি প্রভৃতি প্রার্থনা করতে পার; এবং চাইলে যত দিন খুশি জীবিত থাকতে পার, কিন্তু এ বর থেকে বিরত হও'।

'হে নচিকেতা! যদি মনে হয় এর তুল্য তুমি এমন বর চাও যেমন বিত্তশালী সম্পদ, সুদীর্ঘ জীবন প্রাপ্তি, বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া, তবে তোমায় সে সকল কামনার উপভোক্তা করে দেব'।

'যে সকল কাম্যবস্তু মর্ত্যলোকে দুর্লভ, সেসব তুমি সানন্দে প্রার্থনা করতে পার, এই নাও প্রভূত গীত-বাদ্য মুখরিত অপরূপ রমণীগণ দ্বারা সুসজ্জিত রথ, এমনটি মনুষ্য জীবনে দুর্লভ তো বটেই! আমার প্রস্তাবিত ভোগ্যাদিসকল তোমার সেবায় সদা নিযুক্ত থাকবে—কিন্তু মরণোত্তর বিষয় জানতে চেয়ো না হে নচিকেতা'!

মৃত্যুদেবের এই প্রলোভনে আকৃষ্ট না হয়ে নচিকেতা উত্তর দিল:

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥ঐঃ ১/১/২৬॥
ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥ঐঃ ১/১/২৭॥

নচিকেতা: 'হে মৃত্যুদেব! মর্ত্যলোকে যেসব ক্ষণস্থায়ী ভোগ্যবস্তু রয়েছে, সেসব জ্বালাময় ইন্দ্রিয়তেজ বর্ধক, তা ছাড়া সমস্ত জীবনের আয়ুষ্কাল অতি অল্পই; সুতরাং আপনার প্রস্তাবিত সুসজ্জিত রমণীয় বাহন ও নৃত্যগীতাদি আপনারই থাক'।

'বিত্তদ্বারা মানুষের তৃপ্তি মেটে না; বিত্ত এমনিই পেয়ে যাব যেহেতু আপনার দর্শন পেয়েছি। যত দিন বেঁচে থাকব, আপনার প্রভুত্বেই থাকব; সুতরাং আকাঙ্ক্ষিত সেই মরণোত্তর অমৃতত্ত্ব বরটি আমার চাই'। বৈদিকযুগের এমন শত শত দৃষ্টান্তের অভাব নেই। জাগতিক সম্পদের মোহ কাটাতে না পারলে

CS CamScanner

পারমার্থিক প্রশস্তি আসে না। এটি এমন নয় যে হত দারিদ্রতা নিয়ে সাধন জীবন যাপন করতে হবে। জীবনে অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে, তবে ভক্ষক হিসেবে নয়, রক্ষকরূপে। অর্থ এক ভগবদ্ শক্তি, জীবন নির্বাহ ও পরিপূর্ণতার জন্য এ শক্তির যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। সাধুভাবে ও সৎভাবে উপার্জন করে নিজের জন্য ও ভগবানের জন্য সে সব ব্যয় করা কর্তব্য। যদি এই অর্থশক্তি সাধুজনের হাতে না আসে তবে তা চিরদিন অসুরদের কবলেই রয়ে যাবে। অতএব স্বচ্ছলতার মাধ্যমে যেমন পার্থিব জীবন যাপন করা যায়, তেমনি পারমার্থিক প্রাপ্তি দ্বারা উচ্চতর ভাগবদ্ জীবন গড়ে তোলা মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন গৃহীঋষি যাজ্ঞবল্ক্য। অনেকের একটা বদ্ধমূল ধারণা ভগবানের পথে আসা গৃহী সাধকদের অর্থনৈতিক দারিদ্রতায় পেয়ে বসে; একথা ভুল। কারণ মহামতি যাজ্ঞবল্ক্য, রাজর্ষি জনক, চোখের সামনে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—এঁরা তো কেউ অর্থের প্রাচুর্যতায় কম ছিলেন না! ভগবান কখনও অধিকারীকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন না।

অপৌরুষেয় বেদমন্ত্রের উৎস: সনাতন ধর্মের ইতিহাসে স্বর্ণময় বৈদিক যুগকে জ্ঞানোন্মোচনের উষাকাল বলা হয়েছে। বেদের রাহস্যিক মন্ত্রগুলো সত্য ও অমৃতত্ত্বের জ্যোতি দ্বারা উদ্ভাসিত। জাগতিক সত্য ওই মূল উচ্চতম গভীর সত্যের ছায়া মাত্র যা একমাত্র অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে উপলব্ধ। কালের প্রবাহে প্রথমত একটা ভাষাগত ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, দ্বিতীয়ত গুহ্যবিদ্যা ও গূঢ় অন্তর্নিহিত শক্তিধর বেদমন্ত্রগুলোর অধিকাংশই প্রতীক, সংকেত ও রূপকের আবরণে আবদ্ধ থাকায় সাধারণ মানুষের জন্য এই জ্ঞান উন্মোচন করা একরকম দুঃসাধ্য ছিল। বেদমন্ত্র রহস্যার্থক দিব্যবাক যা অপৌরুষেয়, কোনো মানুষের সৃষ্ট নয়। যারা এই মন্ত্রগুলো দৈব সংরক্ষণাগার থেকে জগতে নামিয়ে এনেছিলেন তাঁদেরকে বলা হয় মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। এই ঋষিকুলের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত সাধক ছিলেন তেমনি ছিলেন ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভূক্ত মনীষীগণও। শুধু তাই নয় বহু নারী ঋষিকাও বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন। এই মন্ত্রগুলোর দিব্য অবস্থান সম্পর্কে ঋষি বলছেন, 'ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ' (শ্বেতাশ্বতর$_{৪/৮}$)। অর্থাৎ 'অক্ষরব্রহ্মের পরম চিদাকাশ যেখানে দেবগণ অবস্থান করেন, সেখানেই ঋক্‌মন্ত্র তথা বেদমন্ত্রগুলো স্থিত'। সুতরাং বেদমন্ত্র যে দিব্যবাক্ এবং পার্থিব জগতের সম্পদ নয়, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আরও বলা হয়েছে ছন্দসমূহ, যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম, ব্রত, সঙ্কল্প, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎসহ ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু বেদে বর্ণিত যা মায়াধীশ ঈশ্বর তাঁর মায়া দ্বারা সৃজন করেছেন; পরমব্রহ্মের প্রকৃতিই মায়া এবং ব্রহ্ম সেই মায়াধীশ (ঐ:$_{৯}$)। বেদমন্ত্র যে দৈব জগতের দিব্যবাক্ তার সমর্থনে আরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

চত্বারি বাক পরিমিতা পদানি$_{১}$, তানি বিদুঃ ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ$_{২}$।
গূহা ত্রীনি নিহিতা ন ইঙ্গয়ন্তি$_{৩}$, তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি$_{৪}$ ॥ঋগ্বেদ: ১/১৬৪/৪৫॥

অর্থ: ব্রহ্মজ্ঞানী মনীষীগণ কর্তৃক চারপ্রকার বাক্ নির্ণিত ও বিদিত হয়েছে, এদের মধ্যে তিনশ্রেণির তুরীয়বাক্ উচ্চতর গুহায় নিহিত, অগম্য; চতুর্থবাকটি মানুষে বলে থাকে (পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী)।
গুহায় নিহিত বলতে অক্ষরব্রহ্মের চিদাকাশের গুহা। সুতরাং বেদবাণী দৈব জগতের গুহা থেকে সত্যদ্রষ্টা ঋষির অন্তরসত্তায় প্রবেশ করে প্রকাশিত হয়েছে; কোনো পুরুষ দ্বারা সৃষ্ট নয়, তাই অপৌরুষেয়।

আত্মার বিভাব: আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যষ্টিরূপ। ব্যষ্টি আত্মা যেমন বিশ্বাত্মার অবিচ্ছেদ্য সংস্করণ, তেমনি পরমাত্মার বিশ্বময় প্রকাশ এই বিশ্বাত্মা। তাই মানবকে বিশ্বাতীতে হাত বাড়ানোর প্রাক্কালে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হয়। নিজেকে জানতে পারলে বৃহৎকে জানা সম্ভব। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির ওপারে তুরীয়, সচ্চিদানন্দের ঝলমল করা জ্যোতির্ময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় ভূমি। অথর্ববেদের অন্তর্গত মাণ্ডুক্যোপনিষদে আত্মার চতুর্পাদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে মাত্র দ্বাদশটি মন্ত্রে। আত্মার প্রথম

CamScanner

পাদ জাগ্রত ভূমিতে বৈশ্বানর, দ্বিতীয়পাদ স্বপ্নভূমিতে তৈজস, তৃতীয়পাদ সুষুপ্তি ভূমিতে বিজ্ঞানময় প্রাজ্ঞ আত্মা এবং চতুর্থপাদ আনন্দময় ভূমিতে তুরীয় আত্মা অর্থাৎ পরমআত্মা। সুতরাং ঋষি আদিষ্ট পথ নির্দেশনা দ্বারা মানবকে আপন সাধনার মাধ্যমে জাগ্রত ভূমি থেকে স্বপ্ন-সমাধির তুরীয় ভূমিতে গিয়েই পরমের সাক্ষাৎ পেতে হয়। বিষয়টি খুববেশি সহজ নয়, তাই বলা হয়েছে—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥কঠ: ১/৩/১৪॥

অর্থ: হে অমৃতের পুত্রগণ! ওঠো, জাগো, বরণীয়দের ভালো করে জেনে লাভ কর এই জ্ঞান। অনেক দূরের এ পথ, বড়ই দুর্গম—ক্ষুরের অগ্রভাগের মতোই ধারালো, মহাজ্ঞানী দ্রষ্টা ঋষিরা একথা বলে গেছেন।

লালন আরও সহজ করে বলেছেন, 'বেদে নাই যার রূপরেখা, পাবে সামান্যে কি তার দেখা'।

পার্থিব ভূমিতে বেদমন্ত্র বা তুরীয়বাকের অবতরণ: বেদের এই তুরীয় বাকত্রয় সাধারণত জগতে প্রকাশিত হওয়ার নয়। কিন্তু মানব যখন প্রজ্ঞা বলে বলীয়ান হয়ে দিব্যজ্ঞানে অভিষিক্ত হয়, তখনই ওই অপৌরুষেয় ঐশীবাক্ জগতে নামিয়ে আনতে পারে। এই কর্মটি সংসিদ্ধ করেছেন বেদের দ্রষ্টা ঋষিরা। বেদমন্ত্রসমূহ ঋষিদের সত্যশ্রুত ও সত্যদৃষ্ট তুরীয় জ্ঞানের আকর। বেদ যেমন দিব্য জ্ঞানের সম্ভার, তেমনি অধ্যাত্মতত্ত্বের রহস্য উন্মোচনের অভ্রান্ত প্রামাণিক বিদ্যা। এই মন্ত্রসমূহের মধ্যে যেমন রহস্যপূর্ণ আত্মজ্ঞান দৃষ্ট হয়, তেমনি গভীরতম সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বলিত বিশ্বাত্মক জ্ঞান তথা বিশ্বাতীতের বিজ্ঞান ও আনন্দ উন্মোচিত হয়। ঋষিরা আত্মজ্ঞান দিয়ে শুরু করলেন—কারণ তারা আবিষ্কার করেছিলেন যে, প্রাতিভাষিক জগতে সৃষ্টির প্রতিটি স্থূলসত্তার গভীরে অন্তরতম দিব্যসত্তা বিদ্যমান যার আবির্ভাব ঘটেছে পরমসত্তা থেকে। সুতরাং ব্যষ্টি আত্মাকে জানতে পারলে (আত্মানং বিদ্ধি) বিশ্বাত্মা তথা বিশ্বাতীত পরমাত্মাকে জানা যাবে। বিষয়টি এতই গভীর ও গুঢ় রহস্যে আবৃত যে এই গুহ্যতত্ত্বকে উন্মোচন করতে হলে মানবের প্রাকৃত চেতনাকে পরিশোধনের মাধ্যমে উচ্চতর জ্ঞানমার্গে আরোহণ করতে হয় এবং বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন ও সুনির্দিষ্ট বিধানে সাধনার ক্রম পরিণতিতে সুগভীর পরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে উচ্চস্তরের এই অধ্যাত্ম জ্ঞান উপলব্ধির মধ্যে নামিয়ে আনতে হয়। প্রতিটি স্তরের এই উপলব্ধ জ্ঞানকে তাঁরা বিভিন্ন প্রতীক, রূপক ও সংকেত দ্বারা সূচিত করেছেন। প্রতিটি বাক্ বা মন্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি নিহিত। ঋষিদের ঐকান্তিক তপস্যা ও অধ্যাবসায়ের ফল এই বেদমন্ত্রগুলো। প্রতিটি মন্ত্রই দ্ব্যর্থক, বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ গুহ্য অর্থের দ্যোতক। বাহ্যার্থে বেদমন্ত্রগুলো অন্তর্গূঢ়ার্থের ছদ্মবেশ বা বহিরাবরণধারী মুখোশ মাত্র। ঐশী গুহায় নিহিত এই বেদ মন্ত্রসম্ভার যোগযুক্ত দ্রষ্টা ঋষির অন্তরে প্রবেশ করে তুরীয় শক্তি উন্মোচিত হয়। এই আধ্যাত্ম তত্ত্ব ও গুহ্যজ্ঞান লাভ করেই ঋষিরা দিব্যসত্যের উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু যারা শুধুমাত্র বেদের বাহ্যার্থ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে তারা অমৃতফলের খোলসটি নিয়েই থাকে—রহস্যময় রসের সন্ধান পায় না। 'অপরে যাঁরা অবিরাম বেদ-ধেনুর দুগ্ধ-পানে অসমর্থ, তাঁরা বন্ধ্যাগাভি নিয়ে বিচরণ করেন, তাঁদের কাছে বেদ-বৃক্ষ ফল-পুষ্পহীন শুষ্কবল্লরী মাত্র। দ্বিধাহীন নিঃসঙ্কোচ উক্তি'; (শ্রীঅরবিন্দ: বেদ রহস্য পৃ. ৭)। তাই সর্বসাধারণের দ্বারা এই জ্ঞান আহরণ বড়ই কঠিন। যদি কেউ স্বেচ্ছাচারী হয়ে এই গুঢ়ার্থ উন্মোচন করতে যায় তবে এই বিদ্যার অপব্যাখ্যা হওয়ার ভীতি এড়ানো দুঃসাধ্য। এর ফলে সত্য অনুদিত হয় মিথ্যায়, জ্ঞান রূপায়িত হয় অজ্ঞানে এবং শিব হয়ে যায় অশিব।

বেদের প্রতীক-সঙ্কেতের গুপ্ত চাবিকাঠি: বেদের অর্থ অপব্যাখ্যা হতে পারে এই ভয়ে বেদবাণীর রাহস্যিক অর্থ প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক প্রতীক ও সূত্রাকারে গোপন রাখা হয়েছিল এবং এই গুহ্যবিদ্যা শুধুমাত্র গুরুশিষ্য পরম্পরায় হস্তান্তরিত হত। আধুনিক যুগেও বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত বৃহৎ কর্মকাণ্ড

CamScanner
CamScanner

সাধারণের কাছে উন্মোচন করা হয় না, এগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রথম স্তর, দ্বিতীয় স্তর ও তৃতীয় স্তরের গুপ্তচাবি (Password) ব্যবহার করা হয়। যাদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান রয়েছে শুধুমাত্র তাদের হাতে এই Password থাকে, এবং তারাই এই যন্ত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। সকলের হাতে যদি এই গুপ্তচাবি চলে যায় তবে বৃহত্তর এই যান্ত্রিক অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবে। এই কৌশলটি ব্যবহার করে ঋষিরা কঠোর পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিষ্যকে এই জ্ঞান দান করতেন। অর্থাৎ গুরুশিষ্য পরম্পরায় এই গুপ্তধন হস্তান্তর হতো। 'প্রতীকের আবরণে রচিত যবনিকার পিছনে রহস্য-ব্যাপারগুলো রেখে এমন সব সংলাপ ও নির্বহণ-সূত্র প্রণীত হয়েছিল যার অর্থ দীক্ষিত শিষ্যদিগেরই বোধগম্য। অপরের কাছে সেগুলো ছিল অবোধ্য বা বোধ্য হতো কেবলমাত্র বাহ্যার্থে যা প্রকৃত রহস্যার্থকে গোপায়িত রাখত। সর্বত্র রহস্যবাদের এইটেই সার কথা' (শ্রীঅরবিন্দ, বেদরহস্য পৃ. ৫)। এই সূত্রের উপর ভিত্তি করে পুরাকালে বৈদিক আশ্রম গড়ে উঠেছিল যেখানে গুরুরূপী ঋষিগণ ব্রহ্মচারী শিক্ষার্থীদের (অন্তেবাসী) আত্মানুশীলনমুখী প্রশিক্ষণ দ্বারা প্রস্তুত করে তুলতেন এবং জ্ঞানান্তে বেদের রহস্যাবৃত প্রতীক উন্মোচনের গুপ্ত চাবিকাঠি তাদের হাতে ন্যস্ত করতেন। এই ভাবে বেদের পারমার্থিক লোকোত্তর মহতি আধ্যাত্মিক জ্ঞান পরম্পরাগতভাবে চলতে থাকে এবং কালের প্রবাহে এই পরম্পরার ছেদ পড়ায় একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল যা এখনও পূরণ করা সম্ভব হয়নি। যে কোনো বিষয়ের ধারাবাহিকতার ছেদ যত বেশি দীর্ঘায়িত হবে বিষয়টি ধীরে ধীরে ততই হারিয়ে যাবে। শ্রীভগবান থেকে প্রাপ্ত গীতার অব্যয় যোগ বিবস্বান তাঁর পুত্র মনুকে বলেছিলেন, মনু ইক্ষ্বাকুকে—এই ভাবে রাজর্ষি পরম্পরা এই মহতী যোগ প্রাপ্ত হয় এবং সুদীর্ঘ কালপ্রবাহে এক সময় এই যোগ নষ্ট হয়ে যায় বিধায় শ্রীভগবান আবার অর্জুনকে তা দান করলেন। শক্তি সর্বদা প্রকাশ হতে চায়—যদি স্থান, কাল ও পাত্রের উপযুক্ততা থাকে। শক্তিই আধারকে আশ্রয় করে জ্ঞানে রূপ নেয়। বেদমন্ত্রগুলো যেমন গুহ্যতত্ত্বে ভরপুর, তেমনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরম নিশানা যার সহায়ে সচ্চিদানন্দের সৎ-চিৎ ও আনন্দের মধ্যে একাকার হওয়া যায়। এমন অমৃতময় পরমের সত্যস্বরূপ তুরীয়বাক্ ঋষিগণ তাঁদের উপলব্ধ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সাক্ষাৎ দর্শন করে অন্তর্নিহিত গুঢ়ার্থ পরম্পরাগতভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। বেদের শব্দার্থ ও তার প্রয়োগ সম্পর্কিত শব্দকোষকে নিরুক্ত বলা হয়। সুপ্রাচীন কালের নিরুক্তকার যাস্কের কাছেও বেদের অনেক শব্দের অর্থ অবিদিত ছিল (শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় চারশতেরও অধিক)। 'বেদে কি আছে এই প্রশ্নের উত্তরে যাস্কমুনির সঙ্কেতটির উপর গুরুত্ব অর্পণীয়। তাঁর মতে বেদ হ'লো ক্রান্তদর্শী কবিদের প্রজ্ঞায় উদ্ভূত স্বতঃস্ফূর্ত বাক্। প্রাচীন পরম জ্ঞানের অন্বেষণে এই সূত্রই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। অন্যথা বেদ চিরকালের নিমিত্ত আমাদের কাছে সিলমোহরে আবদ্ধ গ্রন্থই থেকে যাবে। ব্যাকরণ বিশারদদের বা ব্যুৎপত্তিবিদ্‌দের বা পণ্ডিতদের অনুমান-বহুল তর্ক-বিতর্কের সহায়ে এই নিহিত জ্ঞানকক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হবে না' (ঐ: পৃ. ৬)। তবে বেদের অন্তর্নিহিত গুঢ়জ্ঞান ও তার গুহ্যার্থ বিলুপ্ত হলেও সেটিকে উদ্ধার করে রক্ষা করার সূত্রটি যে একেবারে অবলুপ্ত হয়নি সে সম্পর্কেও যাস্ক উৎসাহব্যঞ্জক ভাষ্য প্রদান করলেন, "বেদের সত্য-অর্থের সাক্ষাৎকার হয় ধ্যানযোগে বা তপস্যা দ্বারা'। এর প্রয়োগে যাঁরা সমর্থ তাঁদের জন্য অন্য কোনো বাহ্য সহায়ের প্রয়োজন হয় না। যাস্কের এই উক্তি অতি সুস্পষ্ট ও অসন্দিগ্ধ" (ঐ: পৃ. ৮)।

বেদের গুপ্ত রহস্যের উন্মোচন: মানবের জড়চেতনা যোগযুক্ত হয়ে যখন তুরীয় ভূমিতে ওঠে তখন সে অসীম জ্ঞানের অধিকারী হয়ে যায়। অতীন্দ্রিয় শক্তি অর্জিত হলে বেদের মন্ত্রগুলোর প্রতীক ও সঙ্কেত উন্মোচনের চাবিকাঠি সাধকের হস্তগত হয়ে যায়। তখন বাহ্য অর্থ আর থাকে না—গুহ্য প্রতীক ও সঙ্কেত সাধকের চেতনার পর্দায় উদ্ভাসিত হলে বেদের অন্তর্নিহিত অর্থের ছদ্ম-আবরণ খসে পড়ে যায়। ঋষিরা যেমন ছিলেন তাত্ত্বিক, তেমনি ভাবুক, মরমী, দ্রষ্টা, কবি ও অমৃতাভিলাষী। পার্থিব ও পারমার্থিক

CS CamScanner

উভয় জগতের সাথে তাঁরা ইন্দ্রিয়জ ও অতীন্দ্রিয়জ বিদ্যা দ্বারা সংযোগ রাখতে সমর্থ ছিলেন। পার্থিব জগতের বিষয় ইন্দ্রিয়জ হওয়ায় তা বুঝতে সাধারণের অসুবিধা হয় না; কিন্তু পারমার্থিক তত্ত্ব অতীন্দ্রিয়জ, তুরীয়ভূমির অতিচেতনার বিষয়, সেই অলৌকিক রহস্য প্রকাশ করতে হলে প্রতীক, সঙ্কেত ও সূত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ সাধারণভাবে আমরা যদি মরমী কবি লালনের গান পর্যালোচনা করি—সেখানেও দেখা যায় বিস্তর প্রতীক ও সঙ্কেতের ব্যবহার হয়েছে। কারণ লালনশাহ্ পরম ব্রহ্মকে নিয়েই এসব রচনা করেছিলেন। যেমন, 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়'। 'পাখি কখন জানি উড়ে যায়.....। বাড়ির পাশে আরশি নগর, সেথায় এক পড়শি বসত করে—আমি একদিনও না দেখিলাম তারে' ইত্যাদি। সুতরাং লালনের অচিনপাখি হৃদয় অন্তঃপুরের আত্মা—ক্ষরপুরুষ, আরশি নগর আয়নার মতো ঝলমল করা হৃদয়ের চিদাকাশ যেখানে অন্তরাত্মার প্রতিবেশী কুটস্থ অক্ষর পুরুষের বাস। মরমী লালনের এই প্রতীকের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে শ্রীভগবানের বাণীতে—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥গীতা: ১৫/১৬॥

অর্থ: জগতে ক্ষর ও অক্ষর এই দ্বিবিধ পুরুষ রয়েছেন। সকল জীবের অন্তরে ক্ষরপুরুষ আর অক্ষরপুরুষ অন্তরদূর্গে স্থিত।

আত্মার স্বরূপ কি এবং কিভাবে এই আত্মার দর্শন পাওয়া যায় সে বিষয়ে ঋষি বলছেন:

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মন্বীশো মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥শ্বে: ৩/১৩॥

অর্থ: প্রতিজীবের হৃদয়গুহায় সর্বদা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ অন্তরাত্মারূপে প্রবিষ্ট। মনন সহায়ে হৃদয়ের বোধি দ্বারা মন্থন করলে এই মনস্বামী স্বপ্রকাশিত হন। যারা এই রহস্য জানতে পারে তারা অমৃত হয়ে যায়।

মানব সত্তা যে উচ্চতর আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহরণে সক্ষম এবং আত্মার দর্শন করা যে সম্ভব, ঋষিকুলের দৃষ্টান্ত দ্বারা তার প্রমাণ মেলে। কিন্তু জ্ঞানের স্রোতে প্রবেশে অসমর্থ ব্যক্তি আপন প্রচেষ্টার দারিদ্রতায় সবকিছু অবোধ্য করে তোলে, স্বাধিকার হারিয়ে ফেলে। নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে, 'গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ' (ব্রহ্মসূত্র১/২/১১)। 'গুহামধ্যে উভয় আত্মাই প্রবিষ্ট এবং দর্শনযোগ্য'। অর্থাৎ ব্যষ্টি ক্ষরপুরুষরূপী অন্তরাত্মা এবং তুরীয় অক্ষর পুরুষরূপী পরমাত্মা উভয়ই মানব হৃদয়ের অন্তপুরের জ্যোতির্ময় গুহায় স্থিত রয়েছেন। ব্যষ্টি অন্তরাত্মা দিয়ে তুরীয় পরমাত্মার সাথে মিলন ঘটে। ব্রহ্মসূত্রও তাই বেদ-উপনিষদের মতো প্রামাণ্য গ্রন্থ। বেদ-উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার অবদান সনাতন শাস্ত্রে অনস্বীকার্য।

বেদের তত্ত্বজ্ঞান: বেদ অপৌরুষেয়। 'সত্যং-ঋতং-বৃহৎ' নিয়েই সমাহিত ঋষিদৃষ্ট বেদবাণী অক্ষয় অব্যয় চিরন্তণী—যুক্তি-তর্ক বহির্ভূত। কথায় আছে বেদবাক্য শিরোধার্য। বেদই জড়জীবনকে দিব্যজীবনে রূপান্তরিত করার পথ নির্দেশক। শুধু তাই নয় ঋষিগণ গবেষণালব্ধ ফল দ্বারা প্রমাণ করেছেন জগতের উৎস পরমব্রহ্ম, জড়ই চিৎশক্তির অবতরণের ফল অর্থাৎ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। জড় আবরণধারী মানবের মধ্যেই রয়েছে সৎ-চিৎ-আনন্দের দিব্য স্ফুরণের গোপন অগ্নিশিখা। হৃদস্থিত গুঢ় জ্যোতির্ময় শিখা ধরেই মানবকে আরোহণ করতে হবে ব্রহ্মের পরাৎপর তুরীয় চেতনায়—এই তার গন্তব্য। 'চিন্ময় যিনি তাঁরই বিলাস এই মৃন্ময় তনুতে, শাশ্বত যিনি এমনি করে তিনিই পরেছেন দুদিনের সাজ—শুধু তাই নয়, যে জড়কে নিয়ে তাঁর এই সাজের মেলা, অফুরান এই ঘরবাঁধার খেলা, সেও কখনও অসার্থক বা অগৌরবের নয়—নিঃসংশয়ে যদি একথা জানি, তবে অসংকোচে বলা চলে, এই পার্থিব জীবনেই ফুটবে দ্যুলোকের দীপ্তি, মর্ত্য আধারেই সার্থক হবে অমৃতের প্রৈতি' (শ্রীঅরবিন্দ: দিব্যজীবন পৃ. ৬)।

CamScanner

যে ভাবে পার্থিব মানব জড় জীবনকে রূপান্তরের মাধ্যমে দিব্যজীবনে উন্নীত হবে তার তত্ত্বজ্ঞান সম্বলিত সিলেবাস নিহিত আছে বেদ ও প্রস্থান ত্রয়ীতে। অধরাকে ধরার কৌশলবিদ্যাই তত্ত্বজ্ঞান যা বেদের সমগ্র মন্ত্রসম্ভারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষরূপে প্রতিপাদিত হয়েছে। মর্ত্য মানবের অমর্ত্যের উচ্চতম শিখরে যাওয়ার সামর্থ্য নেই, কিন্তু অগ্নি তথা সূর্যদেবতা সেখানে যেতে পারেন অথবা সেখান থেকে অমৃতধারা নামিয়ে আনতে পারেন এই ধরা তলে। তাই এই মহতি সংসিদ্ধির জন্য অগ্নি বা সূর্যকে প্রার্থনা করা হয়েছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ঈশ: ১৫॥

অর্থ: 'সুবর্ণময় পাত্র দ্বারা দিব্যসত্যের মুখ আবৃত রয়েছে; হে জগৎপোষক জ্যোতির্ময় সূর্যদেবতা পূষন্! সত্যধর্মের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য সেই আবরণ তুমি অপসারিত কর'।

এখানে সূর্যকে পূষন্‌রূপে আহবান করা হয়েছে। পূষন্‌ই দিব্যদ্রষ্টা যিনি মানবকে একত্বের সর্ব্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে পারেন। মানব অন্তরে অতল গুহায় যে দিব্যসত্য আচ্ছাদিত আছে, এই আচ্ছাদন উন্মোচন করতে পারলেই মানব সত্তা অমৃত ধারার জোয়ারে প্লাবিত হয়ে যাবে; তখন মূল স্রোতে মিলিত হওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র। মানব সাধকের জন্য এই সত্যদ্রষ্টা পুষন্ তাই একান্ত আরাধ্য। এই সকল রূপক উন্মোচন করে পরম ব্রহ্মের দ্বারে উপনীত হওয়াই বেদের সারতত্ত্ব।

মানবের দেবত্ব অর্জন: বেদ অর্থ জ্ঞান। জ্ঞান সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যকে কেউ সৃষ্টি করেনি—স্বয়ম্ভুব। সত্যকে দেখা যায়, শোনা যায়, গ্রহণ ও উপলব্ধি করা যায়—কিন্তু সৃষ্টি করা যায় না। তাই বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। মন্ত্র দ্বারা বেদের অবকাঠামো গঠিত এবং এই মন্ত্রের দ্রষ্টাদের বলা হয় সত্যদ্রষ্টা ঋষি। এই সত্য কোথায় অবস্থিত এমন প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় সচ্চিদানন্দই সত্যের মূল উৎস। মনের বিভাজনে তিনি হয়ে যান সৎ (সত্য), চিৎ (চৈতন্য), এবং আনন্দ অর্থ সত্য ও চৈতন্যের ভাবগ্রাহী উচ্ছলতা। সত্য সর্বদা আনন্দময়, চৈতন্য অর্থ মূল চেতনা—তাও আনন্দময়। কারণ যেখানে মিথ্যা বা অজ্ঞানতা নেই, সেখানে দুঃখের কোনো স্থান নেই, সদা আনন্দময়। ঋষিদৃষ্ট এই দিব্যসত্য রূপ পেয়েছে মন্ত্রে। তাই বেদমন্ত্রে কোনোকিছুর স্বীকৃতি থাকলেই সেখানে সত্যের প্রমাণ মেলে। সুতরাং বেদই সত্যের স্বতঃসিদ্ধ অভ্রান্ত প্রমাণ। অপৌরুষেয় দিব্যবাক্ সত্যদর্শন দ্বারা ঋষি মন্ত্রের মাধ্যমে আপন অপরোক্ষ উপলব্ধিতে এনে নিজে যেমন দিব্যচেতনায় অবগাহিত হয়েছেন, তেমনি অপরকে শ্রবণ করায়ে তাকেও দিব্যশক্তির আধাররূপে জাগরিত করেছেন। এই দিব্যজ্ঞান শ্রবণ দ্বারা গুরুশিষ্য পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়েছিল বলে বেদের অপর নাম শ্রুতি। শ্রোতা যদি তার শ্রুত চেতনাকে দিব্যায়িত করতে পারে তবে তার শ্রুতজ্ঞান যেমন সত্যের ধারক, তেমনি সেও সত্যের সাথে একাকার হয়ে অদ্বয় পরাজ্ঞানের বাহক হয়ে ওঠে। এইভাবে বেদবাণীর আশ্রয় নিয়ে নিত্য অনন্ত ব্রহ্মের সাথে অনিত্য জগৎ তথা মানবের সংযোগ সাধিত হয়েছে। মানব দু'টি জগতে বাস করে—একটি স্থূল জৈবিক, বাহ্যমুখী প্রাকৃত মন-প্রাণ-দেহসর্বস্ব জগৎ, আর অন্যটি তার মহত্তর অন্তরিস্থিত দেবতাকে নিয়ে, যার পরিধি শুধু ব্যষ্টি চেতনায় নয় বিশ্বাত্মক তথা বিশ্বাতীত উৎস পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্তর্জগতই পারে আধ্যাত্মিক স্ফুরণ দ্বারা মানবের সমগ্র জীবনকে উর্ধ্বপানে চালনা করে চিন্ময় দেবের সাযুজ্য লাভ করে পরমসত্তায় নিজেকে নিপতিত করতে। ব্যষ্টি অহংকে অন্তরাত্মার আলোকে উদ্ভাষিত করে হৃদয়কন্দরে গুহায়িত জ্যোতির্ময় দেবের তদাত্মবোধে সত্তার রূপান্তরণই দেবত্ব অর্জনের পথকে সুগম করে তোলে; এর ফলে মন, প্রাণ আর স্থূলদেহও এই রূপান্তরে মূর্ত হয়ে ওঠে। কারণ জড়ের মধ্যে নিহিত অন্তর্যামী পরমপুরুষের নিত্য আকর্ষণই এই দিব্যায়ণের পথে উত্তরায়ণের জয়যাত্রা। ঋষির দৃঢ়সঙ্কল্প কখনও মিথ্যা হতে পারে না। এই মৃন্ময় তনু যদি চিন্ময়ের অবতরণের ফল হয়, তবে আরোহক্রমে এই

CS CamScanner

মৃত্তিকাময় দেহই রূপান্তরিত হবে দেবতার দিব্যবিগ্রহে। এটা মানবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এখানে ঋষির একটা উপমা অতীব প্রাসঙ্গিক—'ব্রহ্ম যেমন জগতের আধার এবং অধিষ্ঠান, তেমনি তার উপাদানও তো তিনি। যে-সোনা দিয়ে পাত্র হলো, সে-সোনা যদি সত্য হয়, পাত্রটা তাহলে কি করে হয় মরীচিকা'? (শ্রীঅরবিন্দ: দিব্যজীবন পৃ. ২৯)।

বেদব্যাস: বেদকে পর্যালোচনা করে দেখা যায় তিনটি অংশ। একটি যাজ্ঞিক ক্রিয়াকাণ্ড সমর্থিত, দ্বিতীয়ত: প্রার্থনা মূলক দেবার্চনা বিষয়ক এবং তৃতীয়টি আত্মতত্ত্বভিত্তিক জ্ঞানকাণ্ড। তবে সাধারণভাবে সারসংক্ষেপে বেদকে ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপেই দেখা হয়। মহর্ষি বেদব্যাসই অখণ্ড বেদকে চতুর্বেদে সঙ্কলন করেছেন। পুরাকালে যারা বিভিন্ন ঋষিকুলে ঘুরে ঘুরে বেদমন্ত্র সংগ্রহ করতেন তাদের সাধারণ নাম বেদব্যাস। এঁদের মধ্যে বিশ্বামিত্র, বামদেব, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠসহ ন্যূনতম আঠাশ জনের নাম পাওয়া যায়। সর্বশেষ বেদব্যাস বলা হয় মহর্ষি পরাশর তনয় কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে। তিনি সংগৃহীত মন্ত্রসম্ভার সঙ্কলন করে সংহিতারূপে চারিভাগে ভাগ করেছেন। কাব্যিক ছন্দে ঋগ্বেদ সংহিতা, কবিতা ও গদ্য ছন্দে যজুর্বেদ সংহিতা, গীত ছন্দে সামবেদ সংহিতা এবং অবশিষ্ট সব নিয়ে অথর্ববেদ সংহিতা। কৃষ্ণদ্বৈপায়নই সর্বশেষ বেদব্যাস।

বেদে মন্ত্রসংখ্যা নির্ণয়: ঋগ্বেদে দশহাজার পাঁচশত বাহান্নটি (১০৫৫২) মন্ত্র রয়েছে যার প্রত্যেকটি মন্ত্রকে একটি ঋক্ বলা হয়। কয়েকটি ঋক্ নিয়ে একটি সূক্ত গঠিত এবং একাধিক সূক্তের সমাহারকে অনুবাক বলা হয়। কয়েকটি অনুবাক নিয়ে একটা মণ্ডল সৃষ্টি হয়। ঋগ্বেদে মোট দশটি মণ্ডল রয়েছে। ঋক্মন্ত্র যখন সুরে ও ছন্দে গীত হয় তাকে বলে সাম। সামবেদে আঠারশত পঁচাত্তরটি (১৮৭৫) মন্ত্রের মধ্যে নিজস্ব পঁচাত্তরটি মন্ত্র ছাড়া সবই ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া। যজুর্বেদে সর্বমোট মন্ত্র সংখ্যা উনিশ শত পঁচাত্তর (১৯৭৫) এবং এখানেও ঋগ্বেদের বেশকিছু মন্ত্র রয়েছে। অথর্ববেদের মন্ত্র সংখ্যা পাঁচহাজার নয়শত সাতাত্তরটি (৫৯৭৭), যার মধ্যে ঋগ্বেদেরও কিছু মন্ত্র দৃষ্ট হয়। বেদের মধ্যে সামবেদ মন্ত্রসংখ্যায় কনিষ্ঠ হলেও শ্রীভগবান গীতার দশম অধ্যায়ে 'বেদানাং সামবেদোঽস্মি' বলে সামবেদকেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে বসিয়েছেন। এর কারণ ছন্দময় সুরের মূর্ছনা। সঙ্গীত দিব্যজগতের সম্পদ। কথিত আছে দেবর্ষি নারদই সঙ্গীতকে দিব্যজগৎ থেকে মর্ত্যে এনেছিলেন। বৃন্দাবনের স্বামী হরিদাসকে দেবর্ষি নারদের অবতার বলা হয় যিনি গুরুরূপে তার শিষ্য তানসেনকে এই দিব্যসম্পদ হস্তান্তর করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাধনার উপলব্ধি দ্বারা দ্বিধাহীন কণ্ঠে গেয়েছিলেন, 'মন দিয়ে যাঁর নাগাল নাহি পাই, গান গেয়ে তাঁর চরণ ছুঁয়ে যাই'। রামপ্রসাদ গানের ভুবনে ব্রহ্মময়ীর দর্শন পেয়েছিলেন। এই জন্য সামবেদকে ভগবান বেদের উচ্চতম শিখরে স্থান দিয়েছেন।

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্: মহর্ষি কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস কর্তৃক সঙ্কলিত বেদমন্ত্রকে সংহিতা বলা হয়; যথা ঋগ্বেদ সংহিতা, যজুর্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা এবং অথর্ববেদ সংহিতা। বেদের মন্ত্রগুলো কিভাবে প্রয়োগ হবে, মন্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা দিয়ে কিভাবে স্ব স্ব যজ্ঞে বিনিয়োগ হয়ে যজ্ঞের সার্থকতা বর্ধিত হবে সেই সকল নিয়ম ও দিকনির্দেশনা নিয়েই বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থ। সুতরাং ব্রাহ্মণগ্রন্থ ক্রিয়াকাণ্ডমুখী। বেদমন্ত্রগুলোর নির্ভুল ছন্দময় পাঠকে সংহিতা পাঠ বলে; আর সন্ধিবিচ্ছেদ করে পাঠকে বলে পদপাঠ। বৈদিকযুগে উভয় পাঠের অনুমোদন ছিল। ঋষিদৃষ্ট মন্ত্রগুলোর ছন্দ রক্ষা করে পাঠ করলে দিব্যবাকের স্ফুরণ ঘটে, মন্ত্রের চেতনা ও শক্তি প্রকাশিত হয়। বেদমন্ত্র কিভাবে সাধনা ও তপস্যার মাধ্যমে আত্মজীবনে প্রয়োগ করে উচ্চতর দেবচেতনায় আরোহণ করা যায় সে সকল বিষয়ে উৎসাহ বর্ধণ, যজ্ঞের নিয়ম-কানুন বিধান, স্তুতিবাক্য পরিবেশন ও আহুতি দান ইত্যাদি কর্মকাণ্ডীয় বিষয়াদি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অন্তর্গত।

CamScanner

আরণ্যক: বেদের আরণ্যক অংশে অগ্নিহোত্র স্থূলযজ্ঞের পরিবর্তে সূক্ষ্ম যাজ্ঞিকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অগ্নি, দুগ্ধ, কাষ্ঠ, ঘৃত, সমিধ সবকিছুই এই পঞ্চভৌতিক দেহ থেকে সংগ্রহ করে ক্রিয়াকাণ্ডমুখী বাহ্যযজ্ঞ রূপ নিয়েছে আন্তরযজ্ঞে। আরণ্যকের যজ্ঞ অনেকটা মানসোপাচারের পূজার মতো। ব্রাহ্মণ অংশের সবকিছুই আরণ্যকে করা হয় কিন্তু এখানে অগ্নির ব্যবহার স্থূল নয়—অন্তরাগ্নি, আর উপাচারও বাহ্য নয়, সূক্ষ্ম। এই পঞ্চভৌতিক দেহের মধ্যে সবই আছে এবং মানসক্রিয়ার দ্বারা যজ্ঞকালে সে সবের প্রয়োগ করাই আরণ্যকের বিশেষত্ব; যেমনটা শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় দ্বাদশযজ্ঞে দ্রব্য যজ্ঞ, ইন্দ্রিয় যজ্ঞ, পঞ্চ তন্মাত্র যজ্ঞ প্রভৃতিতে পৃথক পৃথক আন্তর অগ্নি ব্যবহার করা হয়েছে।

উপনিষদ্: উপনিষদ আরণ্যক অপেক্ষা আরও সূক্ষ্মক্রিয়াবহুল অধ্যাত্ম বিদ্যার দ্বারোন্মোচক শাস্ত্র এবং অধিকতর শক্তিধর; সরাসরি গন্তব্য ব্রহ্মধামে। এই জন্য উপনিষদ্‌কে ব্রহ্মবিদ্যার মুখ্য আকর বলা হয়। ব্রাহ্মণগ্রন্থের স্থূল যজ্ঞরূপ আরণ্যকের সূক্ষ্ম রহস্যবিদ্যায় প্রতিফলন ঘটেছে এবং আরণ্যকের রহস্যবিদ্যা উপনিষদের সূক্ষ্মতম ব্রহ্মবিদ্যায় রূপ নিয়েছে। এই জন্য উপনিষদকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। উপনিষদের মন্ত্রগুলো বেদ অপেক্ষা তুলনামূলক সহজবোধ্য। প্রতিটি বেদেরই ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদ্ থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ থাকলেও আরণ্যকের উপস্থিতি অতি স্বল্প। আবার সব ব্রাহ্মণ গ্রন্থেরও উপনিষদ্ পাওয়া যায় না। সর্বমোট উপনিষদের সংখ্যা দুই শতের উপরে হলেও ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, প্রশ্ন, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই দ্বাদশ উপনিষদ্‌কে মুখ্য উপনিষদ্ বলা হয়।

বেদাঙ্গ: মুণ্ডকোপনিষদে ১/৫ মন্ত্রে ঋষি স্পষ্টভাবে বেদের অঙ্গ বর্ণনা করেছেন, যেমন শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প।

(১) শিক্ষা: বেদ অনুশীলনের জন্য প্রথম প্রয়োজন সাধ্যায় বা অধ্যয়ন। সংস্কৃত বর্ণমালা ও তা দ্বারা গঠিত শব্দ এবং তার নির্ভুল উচ্চারণ ও প্রয়োগরীতি নিয়েই শিক্ষা। অর্থাৎ স্বর ও তার প্রয়োগবিধি শিক্ষা অংশে বর্ণিত। আবার তৈত্তিরীয়োপনিষদে শিক্ষাবল্লীতে বলা হয়েছে: 'ওঁ শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ' ॥তৈঃ ১/২॥

অর্থ: শিক্ষাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছি। বর্ণবিন্যাস, স্বরবিন্যাস, মাত্রাবিন্যাস, বলবিন্যাস, সাম এবং সন্তান—শিক্ষা অধ্যায়ে মন্ত্রোচ্চারণের এই ষড়বিধ নিয়ম বর্ণিত হয়েছে।

(২) ছন্দ: ছন্দকে শুধু অলঙ্কার বললে ভুল হবে, বরং ছন্দ দৈবী ভাষার মাধুর্য ও শক্তির বাহক। বৈদিক ছন্দ অক্ষর নির্ভর—'যদক্ষরপরিমাণং তচ্ছন্দঃ'। কারণ অক্ষর সংখ্যা দিয়ে ছন্দ নির্ণয় হয়। আক্ষরিক বিধিবদ্ধ লয়তানের উঠা নামাকে ছন্দ বলে। বেদে মূল ছন্দের সংখ্যা সাত। কিন্তু সবমিলে ছন্দসংখ্যা বিংশতি ছাড়িয়ে। উদাহরণস্বরূপ ঋগ্বেদের প্রধান সূক্ত ও বালখিল্য সূক্তের ছন্দ, অক্ষর সংখ্যা ও মন্ত্র সংখ্যার একটা সারণী দেওয়া হলো:

ঋগ্বেদের প্রধান সূক্ত

ক্রম	ছন্দ	অক্ষর সংখ্যা	মন্ত্র সংখ্যা		ক্রম	ছন্দ	অক্ষর সংখ্যা	মন্ত্র সংখ্যা
১	গায়ত্রী	২৪	২৪৪৯		১১	অষ্টি	৬৪	৭
২	উষ্ণিক	২৮	৩৯৮		১২	অত্যষ্টি	৬৮	৮২
৩	অনুষ্টুপ	৩২	৮৫৮		১৩	ধৃতি	৭২	২
৪	বৃহতী	৩৬	৩৭১		১৪	অতিধৃতি	৭৬	১
৫	পংক্তি	৪০	৪৯৮		১৫	দ্বিপদা গায়ত্রী	১৬	৩
৬	ত্রিষ্টুপ	৪৪	৪২৫১		১৬	দ্বিপদা বিরাট	২০	১৩৯
৭	জগতী	৪৮	১৩৪৬		১৭	দ্বিপদা ত্রিষ্টুপ	২২	১৪
৮	অতিজগতী	৫২	১৭		১৮	দ্বিপদা জগতী	২৪	১
৯	শক্বরী	৫৬	১৯		১৯	একপদা বিরাট	১০	৫
১০	অতিশক্বরী	৬০	১০		২০	একপদা ত্রিষ্টুপ	১১	১
							মোট :	১০৪৭২

CamScanner
CamScanner

ঋগ্বেদের বালখিল্য সূক্ত

ক্রম	ছন্দ	অক্ষর সংখ্যা	মন্ত্র সংখ্যা
১	গায়ত্রী	২৪	৭
২	অনুষ্টুপ	৩২	২
৩	বৃহতী	৩৬	৫৬
৪	পংক্তি	৪০	১
৫	ত্রিষ্টুপ	৪৪	৭
৬	জগতী	৪৮	৭
		মোট :	৮০
		সর্বমোট (১০৪৭২+৮০) :	১০৫৫২

উৎস: Prasanna Chandra Gautam: The Rig Veda Samhitaa, Vol1. Page: xxx

(৩) **ব্যাকরণ:** সন্ধিবিচ্ছেদ, বিভক্তি ছেদন করে প্রকৃত ধাতুরূপ নির্ণয়, কারক, সমাস, প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ ইত্যাদি জানা থাকলে মন্ত্রের শব্দার্থ ও প্রায়োগিক ভাব জানতে অনুকুল হয়। তবে বেদের সূক্তগুলো পানিনির আধুনিক ব্যাকরণকে মেনে চলে না। কারণ বৈদিকযুগে ব্যাকরণের বিধিবদ্ধ প্রচলন ছিল না। পানিনি তার 'অষ্টাধ্যায়ীতে' ব্যাকরণের সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

(৪) **নিরুক্ত:** বেদের শব্দকোষকে বলা হয় নিঘণ্টু, আর যে শাস্ত্রে নিঘণ্টুর ব্যাখা করা হয় তাকে নিরুক্ত বলে। পণ্ডিত যাস্ক নিঘণ্টু ভিত্তিক যে ভাষ্য রচনা করেছেন তার নাম নিরুক্ত। শ্রীমৎ অনির্বাণের মতে, 'নিরুক্তের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল ভেঙে বলা। ব্যাকরণও পদকে ভাঙে, নিরুক্তও ভাঙে। কিন্তু দুয়ের তফাত আছে। ব্যাকরণ হলো শব্দানুশাসন, আর নিরুক্ত হলো অর্থানুশাসন। .....অন্যান্য বেদাঙ্গের মতো নিরুক্তেরও উৎস হলো ব্রাহ্মণ' (বৈদিক সাহিত্য প্রথম খণ্ড পৃ. ৩৪৭-৪৮)। অধ্যাপক উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'যাস্ক প্রণীত নিরুক্ত' ৩৪ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত দুর্গাচার্য্যের নামোল্লেখ করে বলা হয়েছে—বর্ণের আগম,বর্ণের বিপর্যয় বা পরিবর্তন, বর্ণের বিকার, বর্ণের নাশ ও বিশেষ অর্থে ধাতুর যোগ এই পাঁচটি বিষয়কে নিরুক্ত বলে।

(৫) **জ্যোতিষ:** দিন-ক্ষণ, অমাবশ্যা-পূর্ণিমা, অহোরাত্র, মাস, অয়ন, সাংবৎসর, রাশি-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্যের অবস্থান প্রভৃতি শুভ কর্মের জন্য দেবমুহূর্ত নির্বাচন জ্যোতিষ শাস্ত্রের দায়িত্ব। দেবমুহূর্ত বলতে যে ক্ষণে ভগবদশক্তি অবতরণের জন্য বিশ্বপ্রকৃতি অনুকুল থাকে।

(৬) **কল্প:** কল্প শব্দের অর্থ যজ্ঞ ও তা নির্বাহের প্রয়োগ কৌশল। যজ্ঞ সাধারণত তিন শ্রেণির—শ্রৌত যজ্ঞ, স্মার্ত যজ্ঞ ও পঞ্চ মহাযজ্ঞ।

শ্রৌত যজ্ঞ: বেদের ব্রাহ্মণ অংশের বিধি অনুসারে শ্রৌতযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। এই যজ্ঞে গুরু ও দীক্ষিত শিষ্য একাধিক যজ্ঞস্থণ্ডিল দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করেন।

স্মার্ত যজ্ঞ: গৃহে রন্ধনকর্মে এই যজ্ঞের ব্যবহার। উনুনের অগ্নিতে এই আহুতি দান করা হতো পূরাকালে।

পঞ্চমহাযজ্ঞ: ব্রহ্মাযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ আর ভূতযজ্ঞ নিয়ে পঞ্চমহাযজ্ঞ।

ব্রহ্মযজ্ঞ: ঋষিকুলে ব্রহ্মযজ্ঞের ক্রিয়াবিধি দ্বিজ দ্বারা সম্পন্ন হতো। অধুনাকালে চারিবেদের প্রথম চারিটি মন্ত্র দ্বারা হৃদয়বেদীর স্থণ্ডিলের যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়াকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলা হয়। সকল দ্বিজের গায়ত্রীমন্ত্র ও ব্রহ্মযজ্ঞ নিত্য কর্তব্য।

দেবযজ্ঞ: দেবতার উদ্দেশ্যে হোমযজ্ঞাদি করাকে দেবযজ্ঞ বলে।

পিতৃযজ্ঞ: পিতৃলোক দ্যুলোকের পূর্ববর্তী স্তর। দেবলোকের মতো পিতৃলোক থেকেও শক্তি সঞ্চারিত হয় মনুষ্যলোকে। যাঁরা মানবকে পার্থিবলোকে আলোর মুখ দেখিয়েছে—লোকান্তরিত হলেও পরম্পরার প্রতি তাদের একটা দায় থেকে যায়। তদ্রুপ মর্ত্য মানবকেও পিতৃকূল স্মরণে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস রেখে

CamScanner

CamScanner

দেবযজ্ঞের মতো সাংবাৎসরিক বা বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধাদির মাধ্যমে পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন করতে হয়। গৃহে শুভকর্মের প্রারম্ভে যে আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ করা হয় তা এই পিতৃযজ্ঞের অঙ্গীভূত।

<u>নৃযজ্ঞ</u>: পূরাকাল থেকে অতিথি সৎকার করা হতো নারায়ণ জ্ঞানে, যা প্রতিটা গৃহে পুণ্যকর্ম বলে সমাদৃত ছিল। তাই প্রত্যহ গৃহে শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের খাদ্য গ্রহণ করায়ে গৃহকর্তা ও পত্নী অভুক্ত থেকে অতিথির আগমনের জন্য অপেক্ষায় থাকত। অনুরূপভাবে অতিথিগণও মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হলে গৃহস্থের বাড়িতে প্রবেশ করত না। অনাহারী অতিথি সেবাই নৃযজ্ঞ বলে কথিত।

<u>ভূতযজ্ঞ</u>: সকল জীবেরই অন্ন প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। পূরাকালে খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার পর গৃহের চতুপার্শ্বে চৌদ্দটি পিণ্ড রাখা হতো, উদ্দেশ্য পশুপাখিসহ সমস্ত প্রাণী যেন অন্নগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। অর্থাৎ সমস্ত জগতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ। এই হলো কল্প বা যজ্ঞের অবস্থান তথা বেদাঙ্গ।

বেদে দেবতার সংখ্যা নির্ণয়: এবার দেখা যাক বেদে দেবতার অবস্থান। বেদ যদি সনাতন ধর্মের মূল গ্রন্থ হয় তবে সেখানে দেবতার সংখ্যা অবশ্যই থাকতে হবে। ঋগ্বেদে যে সকল দেবতার উল্লেখ রয়েছে তাঁদের অধিকাংশের নাম দেওয়া গেল—
অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, ভগ, মার্তণ্ড, সূর্য, সবিতা, দক্ষ, বায়ু, মরুৎগণ, বিষ্ণু, পর্জ্জন্য, পূষা, ত্বষ্টা, অশ্বীদয়, সোম, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, যম, ত্রিত, আপ্ত্য, অহির্বুধ্ন, অজ, বিশ্বকর্ম্মা, হিরণ্যগর্ভ, স্কন্ধ, প্রজাপতি, পুরুষ, ব্রহ্ম, অদিতি, উষা, সরস্বতী, ইলা, ভারতী, মহী, হোত্রা, ধীষণা, অরণ্যানী, অগ্নায়ী, বরুণানী, অশ্বিনী, রোদসী, রাকা, সিনিবালী, গুঙ্গূ, শ্রদ্ধা ও শ্রী। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক—এই তিন স্তরে দেবতাদের অবস্থান।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সঙ্কলন রমেশ চন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদ সংহিতায় সংযুক্ত হয়েছে। সেখানে তিনি দেবতার সংখ্যা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, "হিন্দুর মুখে ত শুনি, হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি। কিন্তু দেখি বেদে আছে দেবতা মোটে তেত্রিশটি। ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তের, ১১ ঋকে ঋষি অশ্বীদয়কে বলিতেছেন—'তিন একাদশ (৩x১১=৩৩) দেবতা লইয়া আসিয়া মধু পান কর" (ঐ, পৃ. ৩১)।
একাদশ রুদ্র$_{(১১)}$, দাদ্বশ আদিত্য$_{(১২)}$, অষ্টবসু$_{(৮)}$ এবং দ্যাবাপৃথিবী$_{(২)}$—এই তেত্রিশ দেবতার কথা শতপথ ব্রাহ্মণে ও মহাভারতে দৃষ্ট হয়—
<u>একাদশ রুদ্র</u>: অজ, একপদ, অহির্বুধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, এ্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন, ঈশ্বর।
<u>দাদ্বশ আদিত্য</u>: ভগ, মিত্র, জলেশ্বর, বরুণ, ধাতা, অর্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র, বিষ্ণু।
<u>অষ্টবসু</u>: ধর, ধ্রুব, সোম, সবিতা, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস।
<u>দ্যাবাপৃথিবী</u>: দ্যৌ এবং পৃথিবী।

দেবতার সংখ্যা নিয়ে ঋগ্বেদের কতিপয় মন্ত্র:

আ নাসত্যা ত্রিভিঃ একাদশৈঃ$_{১}$ ইহ দেবেভিঃ যাতং মধুপেয়ম্ অশ্বিনা$_{২}$
প্রায়ুঃ তারিষ্টং$_{৩}$ নী রূপাংসি মৃক্ষতং$_{৪}$ সধতং দ্বেষো ভবতং সচাভূবা$_{৫}$ ॥ঋগ্বেদ ১/৩৪/১১॥

অর্থ: হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! তিন একাদশ দেবতার সাথে মধু পানার্থে এখানে আসুন। আমাদের আয়ুবর্ধন ও পাপ খণ্ডন করুন। বিদ্বেষীগণকে প্রতিরোধ করে আমাদের সঙ্গে অবস্থান করুন।

শ্রুষ্টীবানো হি দাশুষে দেবা অগ্নে বিচেতসঃ$_{১}$।
তান্ রোহিদশ্ব গির্বণঃ$_{২}$ ত্রয়ত্রিংশতমা বহ$_{৩}$ ॥ঐ ১/৪৫/২॥

অর্থ: হে অগ্নি! লোহিত অশ্বযুগলসহ আপনি স্তুতিভাজন; প্রজ্ঞাবান দেবতাসকল সানন্দে স্তুতি শ্রবণ করে অভীষ্ট প্রদায়ক। তেত্রিশ দেবতাকে অমাদের কাছে নিয়ে আসুন।

CS CamScanner

যে দেবাসো দিবি একাদশ স্থ$_{১}$ পৃথিব্যাম্ অধি একাদশ স্থ$_{২}$ ।

অপ্সুক্ষিতো মহিনা একাদশ স্থ$_{৩}$ তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বম্$_{৪}$ ॥ঐ ১/১৩৯/১১॥

অর্থ: যে দেবগণ স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীর উপর একাদশ এবং অন্তরিক্ষে একাদশরূপে আপন মহিমায় বাস করেন, তারা সকলে এসে আমাদের যজ্ঞ যেন সুসম্পন্ন করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গীতার বাণীতেও দেখা যায় দেবতায় সংখ্যা তেত্রিশ কিন্তু দ্যাবাপৃথিবী স্থলে অশ্বিনী কুমারদ্বকে বলা হয়েছে। যেমন—

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।

বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥গীতা ১১/৬॥

অর্থ: হে ভারত! দেখ-আদিত্যগণ তথা বসুগণ, রুদ্রগণ অশ্বিনী কুমারদ্বয় ও মরুৎগণসহ বহু আশ্চর্য অদৃষ্টপূর্ব সব রূপ দেখ।

এই তেত্রিশ দেবতা চেতনার তেত্রিশ স্তরে (Plane of Consciousness) অবস্থিত। আমরা যদি বিবর্তনের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করি তবে দেখা যায় জড়চেতনা থেকে উদ্ভিদ চেতনা, উদ্ভিদ থেকে প্রাণী তথা পশু চেতনা, পশু থেকে মানব চেতনা, মানব থেকে ঋষি চেতনা ও দেবচেতনা ইত্যাদি। দেবচেতনারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং এইরূপ তেত্রিশ স্তরের উর্ধ্বে পরমব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় যিনি বহুরূপে তথা জগৎরূপে প্রকাশিত। কোটি শব্দটি দ্ব্যর্থক। কোটি অর্থ স্তর বা ধাপ, আবার সংখ্যাবিচারে একশত লক্ষ। এখানে সংখ্যা বিচার প্রযোজ্য নয়। তিনি যে নিজে জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে—

'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং' ॥ঈশ১॥

'ক্ষণস্থায়ী গতিশীল ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু ঈশ্বরের অবাসন। এসব ত্যাগের সাথে ভোগ করবে; কখনো অন্যের ধনের প্রতি লোভ করবে না'।

দেবতার সংখ্যা নির্ণয়ের প্রামাণ্যতায় উপরোক্ত মন্ত্রগুলোই যথেষ্ট। আমাদের দেবতার পরিচয় আজ এ পর্যন্তই।

প্রস্থানত্রয়ী: ব্রহ্মজ্ঞানের চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌছানোর অভিযানকে বলে প্রস্থান। প্রস্থান তিনটি—শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়। এই প্রস্থানত্রয়ীর অমৃতময় ত্রিধারায় অবগাহন করে পরম ব্রহ্মে একাকার হওয়া যায়। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে—

'..... দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্, ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ' (মুণ্ডক. ১/৪)।

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে থাকেন ব্রহ্মের নাগাল পেতে হলে পরা ও অপরা এই দুটি বিদ্যা জানতে হবে। পরাবিদ্যা অর্থাৎ পরমব্রহ্মের মৌলিক বিদ্যা বা জ্ঞান। আর অপরা বিদ্যা হলো চতুর্বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ। সুতরাং অপরাবিদ্যা অনুশীলনের দ্বারা পরাবিদ্যার নাগাল পেতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমায় টিউবয়েলে জল নেই। যতই হাত দিয়ে চাপ দেওয়া হোক না কেনো—জল আসে না। কিন্তু এক ঘড়া জল ঢেলে চাপ দিলে জল অঝর ধারায় উঠে আসে। তখন অসীম জলরাশির সাথে যুক্ত হওয়া যায়। ওই এক ঘড়া জল অপরাবিদ্যা আর অসীম জলরাশি পরাবিদ্যা। অজ্ঞানতা দূর হলেই জ্ঞানের নাগাল মেলে। অতএব প্রস্থানত্রয়ী অপরা হলেও পরা বিদ্যায় আরোহণের উন্মুক্ত সিড়ি।

বেদের ব্রাহ্মণ অংশকে আমরা বলি ক্রিয়াকাণ্ড; কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক যে এই কর্মকাণ্ডের গভীরে যে

CS CamScanner
CS CamScanner

শক্তিময় অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বালমান যার মধ্যে সব ক্রিয়ার অন্তিমধারা একাকার হয়ে যায়। তখন ক্রিয়াকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ডের কোনো প্রভেদ থাকে না। সুতরাং সমগ্র বেদমন্ত্রই সমৃদ্ধ জ্ঞানমঞ্জরী। বেদের কর্মকাণ্ডের প্রতীক-সংকেতধারী দুর্বোধ্য বিষয়াবলী, মন্ত্রসমূহের সমন্বয়, সুপ্রয়োগ ও বিভিন্ন সংশয় ছেদনের লক্ষ্যে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কীর্তিমান শিষ্য জৈমিনি সূত্রাকারে সমন্বয় সাধন করেছেন যে গ্রন্থে তার নাম 'পূর্ব মীমাংসা'।

অনুরূপে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের রহস্যার্থক বিশ্লেষণ ও আপাত সংশয়ী শব্দ ও বাক্যসম্ভারের অজ্ঞানতা নিরাকরণের জন্য স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদরায়ন মহর্ষি বেদব্যাস সূত্রাকারে যে মীমাংসাত্মক গ্রন্থ রচনা করেছেন তাকে বলা হয় 'উত্তর মীমাংসা' বা ব্রহ্মসূত্র। এঁকে 'ব্যাসসূত্র'ও বলা হয়। এই গ্রন্থে পাঁচশত বাষট্টি (৫৬২) সূত্র রয়েছে।

বেদান্তের আচার্যগণ তাঁদের গবেষণা ও আত্মানুশীলনের অভিজ্ঞতা দ্বারা স্বীকৃতি দান করেছেন যে—প্রস্থান ত্রয়ীই বেদান্তশাস্ত্র। উপনিষদ্‌কে বলা হয় শ্রুতিপ্রস্থান, ভগবদ্‌গীতা স্মৃতি প্রস্থান এবং ব্রহ্মসূত্র ন্যায় প্রস্থান। সুতরাং গীতা উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্র এই ত্রয়ীকেই আমরা বেদান্ত দর্শন বলে অবশ্যই বিবেচনা করতে পারি। কারণ বেদান্ত বলতে বেদের অন্ত বা সার বলা হয়। দুগ্ধের ননী যেমন অমৃতপ্রদায়ী, তেমনি বেদান্ত পরাজ্ঞানের বাহক।

শ্রুতিপ্রস্থান: বেদে নিহিত গুহ্যজ্ঞানের বীজ রয়েছে বেদান্তের মহাবৃক্ষের মধ্যে। ঋষিরা যোগে যুক্ত হয়ে জ্ঞানময় দৃষ্টি দ্বারা অপৌরুষেয় দিব্যবাকের শাশ্বত অমৃতের জ্যোতি দর্শন করে মন্ত্রে, ছন্দে ও কবিতায় রূপ দিয়েছিলেন। গুরু মুখে শ্রুত এই বাণী শিষ্য পরম্পরা স্মৃতিতে ধারণ করত। এই জ্ঞানই শ্রুতি প্রস্থান যা উপনিষদ্ (বেদ) রূপে স্বীকৃত। বেদের রূপক, সংকেত ও প্রতীকের দুর্বোধ্য শৈলীর ব্যূহ উপনিষদে অনেকাংশে সরলীকরণ করার যথাযথ প্রয়াস থাকায় সনাতন সমাজে আদি কাল থেকেই শ্রুতিপ্রস্থান বা উপনিষদ্‌কে বেদের অন্ত বা উপসংহার বা মুকুটমণিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্মৃতিপ্রস্থান: শ্রীমদ্ভগবদগীতা অপৌরুষেয় নয়, পরমপুরুষের বাণী যা দিব্যচক্ষু ও দিব্যকর্ণে শ্রবণ করে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁর স্মৃতিতে ধারণ করে প্রকাশ করেছেন। তাই এই গ্রন্থকে স্মৃতিপ্রস্থান বলা হয়েছে। উপনিষদকে যেমন বলা হয় বেদের সার তেমনি গীতাকে বলা হয় উপনিষদের সারাৎসার। উভয়গ্রন্থই ব্রহ্মবিদ্যার পরম নিদর্শন।

ন্যায় প্রস্থান: ব্রহ্মসূত্রকে বলা হয় ন্যায় প্রস্থান। অতি স্বল্পাক্ষরে বিশাল জ্ঞানময় ভাণ্ডারে সারভূত শৈলী দ্বারা ব্রহ্মসূত্র প্রতিপাদিত হয়েছে যার ব্যাখ্যা ও প্রমাণ যথাযথ যুক্তি নির্ভর বলে এই গ্রন্থকে ন্যায় প্রস্থান বলা হয়েছে। মহর্ষি বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্রের রূপকার।

যজ্ঞের তাৎপর্য: বেদের অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধি করলে বুঝতে পারা যায় বাহ্যিক আচার সমৃদ্ধ ক্রিয়াকাণ্ডবহুল বাইরের অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অন্তর্যজ্ঞেরই এক রূপক বহন করে। যজ্ঞনির্বাহক যজমান, যজ্ঞের পুরোহিত বা ঋত্বিক যিনি যজ্ঞাহুতি দান করেন, যজ্ঞোপাচার ও নৈবেদ্য এবং যজ্ঞের ফল—এই চতুর্বিধ বিষয় নিয়ে যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদিত হয়। যজমান হিতকামনার্থে যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং তার প্রার্থনা ও আকুতি উপাস্য দেবতার কাছে পৌছিয়ে দেওয়ার জন্য পুরোহিত বা ঋত্বিক প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন। এই যজ্ঞ সম্পাদনের অধিকারী ব্যক্তিই পুরোহিত হওয়ার যোগ্য। যজ্ঞের অধিকারী কে—সেই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলেছেন, 'ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা' (গীতা ১৭/২৩)। অর্থ: 'ওঁ তৎ সৎ'-রূপী ত্রিবিধ ব্রহ্মনির্দেশনা পুরাকালে স্মৃতিলব্ধ

CS CamScanner

হয়; এই ব্রহ্মনির্দেশনা ভিত্তিক শব্দত্রয় দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ বিহিত হয়েছে'। অর্থাৎ পরমব্রহ্মই 'ওঁ তৎ সৎ' বাণী দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করলেন এবং ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে যজ্ঞক্রিয়া সুসম্পন্ন করবে। এই জন্য যজ্ঞের ব্রাহ্মণকে সাধক হতে হয়, ভক্ত হতে হয়, নইলে ব্রহ্মজ্ঞান ধারণে অসমর্থ হয়ে উঠবে। বেদমন্ত্র ব্রহ্মশক্তি দ্বারা সঞ্চারিত; যদি নির্ভুল ছন্দে উচ্চারিত হয়, তবে মানবাধারে ভগবদ্‌শক্তি জাগ্রত হয়। সাধনার অন্তর্মুখীনতা না এলে শক্তির জাগরণ ঘটে না। শুধুমাত্র মন্ত্র জানলেই চেতনার স্ফূরণ হয় না। পূজার বেদিটি একটা সাধনপীঠ। ধ্যানসমাহিত চিত্তে বৈদিকমন্ত্র জপ করলে উর্ধ্ব থেকে ব্রহ্মশক্তি অবতরণ করে দেহটি যেমন প্লাবিত হয়ে যায়, তেমনি পূজার বেদিটিও শক্তি-সঞ্চরণে তীর্থে পরিণত হয়; তা পূজার বেদি নিজের গৃহে হোক বা যজমানের গৃহে হোক। মন্ত্রের শক্তি অব্যর্থ, কারণ পূজার প্রতিটি মন্ত্র বেদ থেকে নেওয়া। পূজা সমাপনান্তে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করে আহুতি দ্বারা যজ্ঞ কর্ম সম্পাদন করা হয়। এই যজ্ঞের তাৎপর্য বুঝতে হলে ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রটি অনুধাবন করা আবশ্যক। 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্$_১$ যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্$_২$ হোতারং রত্নধাতমম্$_৩$'॥ 'হে অগ্নি, পুরোহিতরূপে তোমায় পূজা করছি, তুমি এই যজ্ঞের দেবতা, ঋত্বিক, আহ্বানকারী হোতা এবং প্রভূত দৈবীসম্পদের ধারক'। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে অগ্নিদেবের অবাধ যাতায়াত। তাই মানব আস্পৃহা ও সমর্পণযুক্ত প্রার্থনা এই যজ্ঞের মাধ্যমে গ্রহণ করে অগ্নিদেব সুষ্ঠভাবে উপাস্য দেবতার কাছে বহন করে নিয়ে যান। প্রয়োজনবোধে দেবতাগণকে যজ্ঞপীঠে নিয়ে আসেন। যজ্ঞকর্ম সম্পাদনের জন্য একাধিক ঋত্বিক থাকেন। কারণ পূজার মন্ত্রসমূহ চতুর্বেদ থেকে নেওয়া এবং প্রতিবেদের ঋত্বিক ভিন্ন। যেমন ঋগ্বেদের ঋত্বিককে হোতৃ বা হোতা বলা হয়, হোতা অর্থ আহবায়ক (Summoner), যজুর্বেদের ঋত্বিক হলেন অধ্বর্যু, এবং সামবেদের ঋত্বিককে বলা হয় উদগাতা, যিনি উদগীত বা সামগানে পারদর্শী। সর্ব্বোপরি ব্রহ্মা-ঋত্বিক, যিনি সকলবেদের জ্ঞানে সিদ্ধসত্ত্ব। হোতা ঋকমন্ত্র আবৃত্তি দ্বারা দেবতার আহবান করেন এবং অগ্নি দিব্য পুরোহিতরূপে মর্ত্য পুরোহিতের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে যজ্ঞভূমিতে উপাস্য দেবতার প্রাণবন্ত উপস্থিতি ঘটান। এরপর যজুর্বেদের অধ্বর্যু তার মন্ত্রশক্তি বলে মাতরিশ্বা বা বায়ুদেবতার আনুকুল্যতা আনেন। অতঃপর উদ্‌গাতা-ঋত্বিক সামগানে দেবতাদের তুষ্টি বিধান করেন; ফলে সকল বিরুদ্ধশক্তি বিমোচন করে (ভূতাপসারণ) সত্য ও আনন্দের দুয়ার উন্মোচিত হয়। যিনি ব্রহ্মা-ঋত্বিক, যজ্ঞের প্রতিটি ধাপে সংসিদ্ধ আচার-বিচার, যজ্ঞের আহুতি ও মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতির শুদ্ধতা ধ্যানসমাহিত দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করেন এবং প্রতিক্ষেত্রে সন্তুষ্টি জ্ঞাপক শব্দ 'ওঁ' উচ্চারণপূর্বক সম্মতি প্রদান করেন। এইভাবে যজ্ঞক্রিয়া অভিজ্ঞ ঋত্বিক বা পুরোহিতগণ সুসম্পন্ন করে দেবতার তুষ্টি দ্বারা যজ্ঞনির্বাহক যজমানের ইষ্ট বাসনা পূরণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধুনাকালে ব্যতিক্রমধর্মী কিছু ক্ষেত্র ব্যতীত অধিকাংশ যজ্ঞ সম্পন্ন হয় অচেতনভাবে, অহমাত্মক ভাবধারায় যেখানে মন্ত্রোচ্চারিত হয় যান্ত্রিকভাবে; ফলে মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়, আনন্দের পরিবর্তে দুঃখ-যন্ত্রণা দ্বারা মানবাধার অধিকৃত হয়। যজ্ঞে থাকতে হয় আত্মনিবেদন, এই স্থূলযজ্ঞই সূক্ষ্মযজ্ঞরূপে মানবের হৃদস্থিত অন্তরাগ্নির আহুতি দ্বারা পরমের সাথে অধ্যাত্ম মিলন ঘটায়। যতটুকু আস্পৃহা, সমর্পণ ও আকুতি নিয়ে যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হয়, উপাস্য দেবতা ততটুকু মাত্রায় তা গ্রহণ করেন। আত্মদানের পরিবর্তে লোক দেখানো তামসিকতা ভয়ানক বিনষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সচেতন হোক আর অসচেতন হোক—সমগ্র জীবনটাই এক যজ্ঞ। এই যজ্ঞে কি দান করা হবে, কে এই দান গ্রহণ করবেন—এসব ভাবা অনাবশ্যক; উদ্দেশ্য উপাস্য দেবতাকে অর্ঘ্য প্রদান। এমনকি প্রাত্যহিক অন্নগ্রহণও এক যজ্ঞ, এই অন্ন দেহের ভোগের জন্য নয়; অন্তরের অন্তস্থ গৃহস্বামীকে নিবেদন করছি, দেবতাকে নৈবেদ্য অর্পণ করছি—দৈহিক প্রয়োজন সেখানে গৌন মাত্র। আত্মদান ও সমর্পণ যতই পূর্ণতা পাবে—যজ্ঞকর্ম ততই তেজময় হয়ে দেবতুষ্টি দ্বারা পরমপ্রাপ্তি সংসিদ্ধ হবে। মনে

CS CamScanner

রাখতে হবে জ্ঞানযজ্ঞই সর্বশ্রেষ্ট, দ্রব্যযজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞের সহায়ক কর্ম মাত্র। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে দশম শ্লোকে শ্রীভগবান বলছেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥

অর্থ: প্রজাপতি ব্রহ্মা পুরাকালে যজ্ঞের মাধ্যমে প্রজা সৃষ্টি করে বলেছিলেন, 'এই যজ্ঞদ্বারা তোমাদের ইষ্ট চেতনা বর্ধিত হয়ে অভীষ্টকর্ম সিদ্ধ হোক'।

যে পরম উৎস দ্বারা যজ্ঞের মাধ্যমে মনুষ্যগণ সৃষ্টি হয়েছে, সেই উৎসে ফিরে যেতে হবে এই যজ্ঞের মাধ্যমেই। যজ্ঞহীন জীবন জড়পদার্থ তুল্য। বহির্যজ্ঞ অন্তর্যজ্ঞের রূপক মাত্র। অন্তর্যজ্ঞই মানবকে ঋষিত্ব তথা দেবত্বের আসনে উদ্ভাসিত করে।

উপসংহার: একটা জাতির উত্থান নির্ভর করে তার আপন সংস্কৃতির পরিপুষ্টতার উপর। সংস্কৃতি তখনই জরাজীর্ণ হয়ে যায় যখন মানুষের আত্মসচেতনতা লোপ পায়। বৈদিকযুগের সংস্কৃতি প্রভূত শক্তিশালী হওয়ার মূল কারণ ছিল সে যুগের অধ্যাত্মশক্তির সম্প্রসারণ। এই শক্তি শুধুমাত্র ঋষির আশ্রমে আবদ্ধ ছিল না, গৃহীর অঙ্গনে, রাজদরবারে, বিচারালয়ে সর্বত্রই প্রস্থানত্রয়ীর দিব্যশক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। মানবকে বলা হয়েছে অমৃতের সন্তান, কারণ এই অমৃত সুপ্ত রয়েছে তার অন্তরের অন্তস্থলে। আমাদের পূর্বসূরীগণ সেই সুপ্তশক্তিকে জাগরিত করে সত্তার গভীর গহন থেকে মন্থন করে চেতনার উপরিতলে ছড়িয়ে দিয়ে মন, প্রাণ ও দেহকে অমৃতময় কেন্দ্রিয় শক্তিদ্বারা জারিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই কেন্দ্রিয় শক্তিই তার আধ্যাত্মিকতা। কাল প্রবাহে যথার্থ অনুশীলনের অভাবে এই শক্তি আবার অন্তরের গভীর গুহায় ফিরে গিয়ে হিরণ্ময় পাত্রের মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছে। কে খুলবে এই পাত্রের ঢাকনা? এই ঢাকনা অপসারণ করতে হলে চেতনার জাগরণ ঘটাতে হবে। হারিয়ে যাওয়া ব্রহ্মশক্তি জাগরণের বিধিব্যবস্থা সবই বৈদিক ঋষিগণ আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। এরজন্য আত্মপ্রস্তুতির খুব প্রয়োজন। যদি কেউ মনে করে আমি পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে তারপর বেদ-বেদান্তে প্রবেশ করব তাহলে তার আর কোনো দিনই অমৃত সাগরে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। প্রতিদিনের একাগ্র অনুশীলন সহজাত প্রবৃত্তিকে অবদমিত করে কেন্দ্রিয় শক্তির সাথে মানব চেতনাকে যুক্ত করে দেয়। মানব যতই অন্তর্মুখী হয়ে একাগ্র হবে—ততই তার শুদ্ধি আসবে। একাগ্রতা, শুদ্ধি আর ভক্তি সমানুপাতিক। একটা বর্ধিত হলে অন্য দুটিও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বহির্মুখীনতা, চঞ্চলতা ও মনের জড়ীয় বিক্ষেপকারী ক্রিয়ার অপসারণ ঘটে। এতকাল ধরে যে জন্মগত সহজাত প্রবৃত্তি চলে আসছে—হঠাৎ করে তার পরিবর্তন আসবে না সত্য, কিন্তু মনে রাখতে হবে—মানব সত্তা সর্বদা আলোকমুখী। একজন জন্মান্ধকে এক সহৃদয় ব্যক্তি চক্ষুদান করে আলোর মুখ দেখালে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। কিন্তু দেখা গেল মাঝে মাঝে সকলের অজান্তে সে গুপ্তভাবে অনেকক্ষণ চক্ষুবন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকে। মানবকে যতই আলোর মুখ দেখানো হোক না কেনো, তার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে অন্ধকারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, সেখান থেকে সহসা সরে আসতে পারে না। অধ্যাত্ম সিদ্ধির জন্য ঋষি আদিষ্ট চারিটি সহায় প্রতিটি মানবের জন্য আবশ্যক। প্রথমটি শাস্ত্র, দ্বিতীয়টি শাস্ত্র অধ্যয়নে ধৈর্যসহকারে অবিরাম প্রচেষ্টা। তৃতীয় সহায় গুরু; যিনি আপন আধারে উচ্চতর শক্তি ধারণ করতে সক্ষম এবং ধারণকৃত অধ্যাত্মশক্তি অন্য আধারে সঞ্চারিত করার সামর্থ রাখেন, তিনিই গুরু। চতুর্থ সহায় কাল—যদি আত্মানুশীলনের প্রচেষ্টা অবিরাম ধারায় চলতে থাকে, তবে কাল সহায় হয়ে গুরুর দর্শন মেলে, মানব জীবনে অলৌকিক শক্তির সঞ্চার হয়, চেতনার জাগরণ ঘটে, জীবনের সংস্কৃতি পূর্ণ আধ্যাত্মিক ধারায় রূপ নেয়। মানব মন তখন পূর্বসূরী ঋষিদের রেখে যাওয়া বেদ-বেদান্তের সূত্রাবলী সমাহিত চিত্তে অনুশীলন করে; মানব

CamScanner

জাতি দেবজাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রত্যাশা নিয়ে পূর্বগামী ঋষিকুল আশ্রম সৃষ্টি করেছিলেন, প্রতিটি আশ্রম ছিল এক একটা গবেষণাগার, মানবত্ব থেকে ঋষিত্ব তথা দেবত্ব সৃষ্টির কারখানা। প্রস্থানত্রয়ী থেকে যারা অমৃতের স্বাদ পেয়ে মণীষী হয়েছেন তাদের দু'এক জনের কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি পরিবেশন করে আজকে এই পর্যন্তই রইল।

'আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ্ থেকে, যে উপনিষদকে একদা বাংলাদেশের বেদ-বর্জিত নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বলেছিল রামমোহন রায়ের জাল-করা, যে উপনিষদ্ মানুষের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন, যে উপনিষদের অনুপ্রেরণায় বুদ্ধদেব বলে গিয়েছেন জীবনের প্রতি অপরিমেয় প্রীতিই ব্রহ্মবিহার, সেই পরম চরিতার্থতা দেউলে দরোগায় নয়, পাণ্ডাপুরোহিতের পদসেবায় নয়। ....যখন পুত্রশোকাতুর মা, কি অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে আমাকে এসে বলে যায় যে আমি তাদের জীবনে শান্তি দিয়েছি, তাই তারা আমাকে এত ভালোবাসে, তখন বুঝি আমার গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়ে আমি আমার বড়ো-আমিকে প্রকাশ করেছি, যার সঙ্গে এই প্রতিদিনের আমিটার অনেক তফাত। গীতাঞ্জলি শুধুই যদি কবিতা হতো, তাহলে জনসাধারণের মনে এমন করে স্থান পেতুম না, কারণ কয়জনই বা কবিতা বোঝে? এই বড়োজায়গায় মনকে পৌছে দিতে উপনিষদ্ আমাকে সাহায্য করেছে'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ সুত্র- রবীন্দ্রচেতনায় উপনিষৎঃ অনিল কুমার মুখোপাধ্যায়—পৃ. ৯, ১০

'উপনিষদ্ প্রতি পৃষ্ঠায় আমাকে তেজবীর্যের কথা বলিয়া থাকে। দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। পাপের দ্বারা কি পাপ দূর করা যায়? দুর্বলতা দ্বারা কি দুর্বলতা দূর হইবে? উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য অবলম্বন কর। ....এই বীর্য লাভের প্রথম উপায়—উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া এবং বিশ্বাস করা যে, আমি আত্মা। ....বেদান্তের এই মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে—সর্বত্র এই সকল তত্ত্ব কার্যে পরিণত হইবে। ....বেদান্তের আলোক প্রতি গৃহে লইয়া যাও, প্রত্যেক জীবাত্মায় যে ব্রহ্মত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহা জাগ্রত কর'।

স্বামী বিবেকানন্দঃ বেদান্ত মুক্তির বাণী (অবতরণিকা) পৃ. ২৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

ক্রম	গ্রন্থ	লেখক
১	ঋগ্বেদ-সংহিতা	রমেশচন্দ্র দত্ত
২	বেদ রহস্য	শ্রীঅরবিন্দ
৩	দিব্য-জীবন	শ্রীঅরবিন্দ
৪	যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ
৫	উপনিষৎ প্রসঙ্গ	শ্রীমৎ অনির্বাণ
৬	বৈদিক সাহিত্য,	শ্রীমৎ অনির্বাণ
৭	বেদ-বিচিন্তন	মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
৮	বেদান্ত মুক্তির বাণী	স্বামী বিবেকানন্দ
৯	রবীন্দ্রচেতনায় উপনিষৎ	অনিল কুমার মখোপাধ্যায়
১০	Rig Veda Samhita	R L Kashyap
১১	The Rig Veda Samhitaa	Prasanna Chandra Gautam

CamScanner

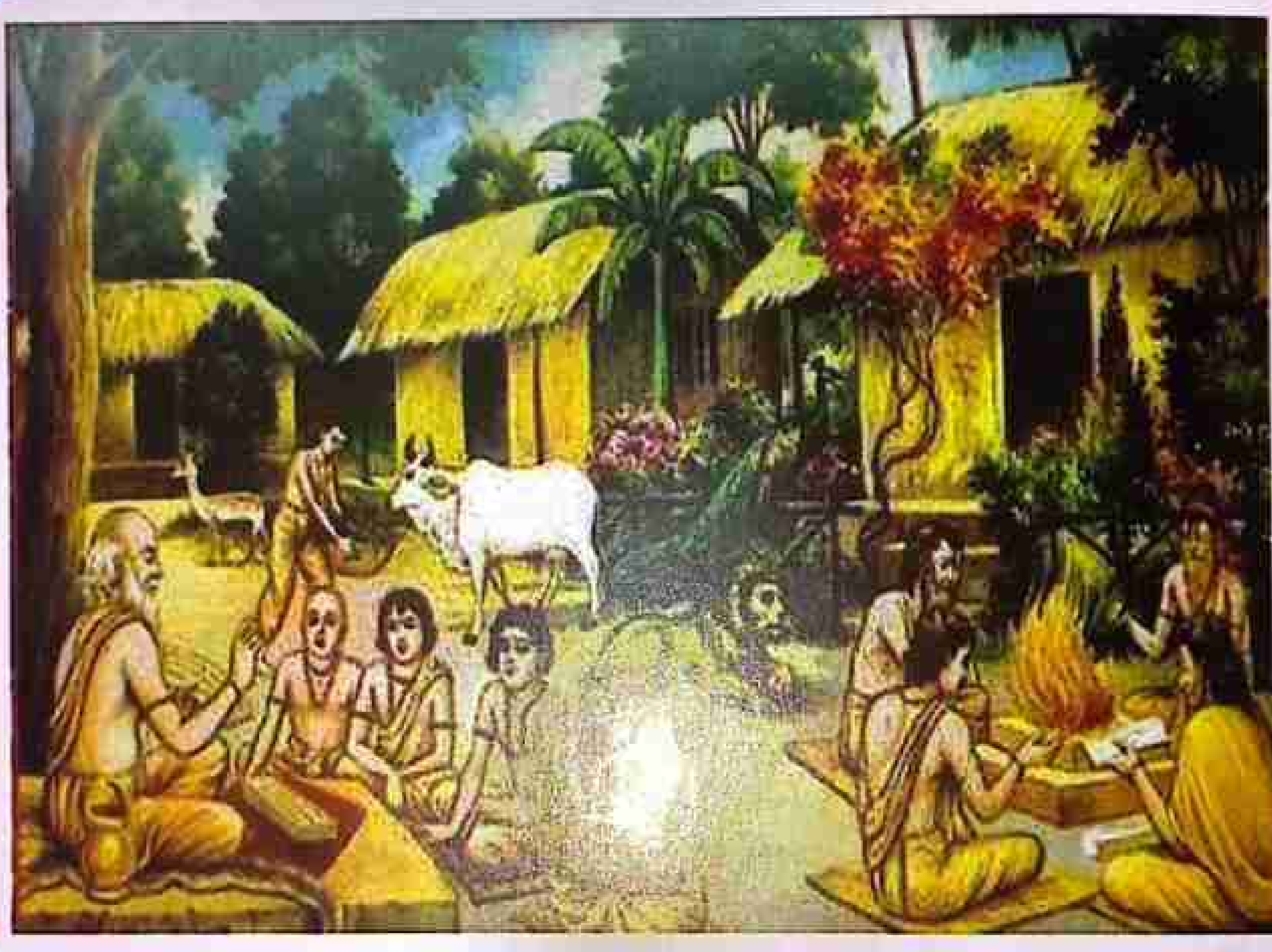

ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়